দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 MAY 2005
পৃঃ ১ ... ৩

সাক্ষরতা আর প্রাথমিক শিক্ষা লক্ষ্যহীন বৃত্তে, অগ্রগতির তুলনায় অপচয় বেশি

শরিফুজ্জামান পিন্টু ॥ দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত বা প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে গত এক যুগে ১৯ প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও অগ্রগতির তুলনায় অর্জন হতাশাব্যঞ্জক। এ বাঘা বাঘা প্রকল্পের পেছনে ১৯

হাজার ৮৪৭ কোটি টাকা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যয় হয়েছে, কিন্তু অপচয়ের অতল গহ্বরেই হারিয়ে গেছে সিংহভাগ। গৌরীসেনের অঢেল টাকা এস্তেমাল করেছে ঘাটে ঘাটে ওত পেতে থাকা

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

সাক্ষরতা আর প্রাথমিক

(প্রথম পাতার পর)

লুটেরার দল। নব্বই পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষায় আলোচিত ১৯ প্রকল্পের মাধ্যমে ১২ হাজার ৮২৪ কোটি টাকা ইতোমধ্যে খরচ হয়েছে। এগারো দাতা সংস্থার এই বিশাল অনুদান, ঋণ এবং সরকারী টাকার মোটা অংশ সর্বগ্রাসী দুর্নীতির গ্রাসে যাওয়া! এর বাইরেও গত এক যুগে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে নানামুখী রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক বরাদ্দ অব্যাহত ছিল।

শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের মতে, বড় বড় কথা এবং গালভরা বুলি আওড়িয়ে একেকটি উদ্যোগ শুরুর পর শেষ হয় অশ্রু ঝরিয়ে, অনিয়মের বদনাম মাথায় নিয়ে। যাদের লুটপাট ও অদক্ষতায় প্রকল্প ব্যর্থ হয়, মুখ থুবড়ে পড়ে তারাই উল্টো পুরস্কৃত হয়, পদোন্নতি পায়। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নির্বাহী ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেয়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম। তিনি অবশ্য দাবি করেছেন, দুর্নীতির কোন অভিযোগে তাঁকে কর্মহীন করা হয়নি।

আলোচিত ১৯ প্রকল্পের মাধ্যমে যে বিপুল টাকা খরচ বা বরাদ্দ হয়েছে, তা রাজস্ব ও উন্নয়ন মিলিয়ে গত তিন শিক্ষা বাজেটের প্রায় সমান। এত টাকা খরচের পরও শিক্ষার হার এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কতটা বেড়েছে তা বিশ্লেষণ করলেই বিনিয়োগ, অগ্রগতি এবং অর্জন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে ইউনিসেফের 'বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০৪' প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে শিক্ষায় বিশ্বের ২৫ খারাপ দেশের তালিকায় ফেলা হয়েছে।

নব্বই পরবর্তী গণতান্ত্রিক আবহে প্রাথমিক শিক্ষার উচ্চাভিলাষী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যসহ কয়েকটি প্রকল্প বা কর্মসূচী বাস্তবায়নের আগে সরকারী হিসেবে শিক্ষার হার ছিল ৩৮ থেকে ৪০ ভাগ। এখন সরকারী হিসেবে এই হার ৬২ ভাগ। অর্থাৎ সাক্ষরতার হার সরকারী হিসেবে বেড়েছে প্রায় ২২ ভাগ। কিন্তু বেসরকারী হিসেবে দেশে শিক্ষার বর্তমান হার ৪১ থেকে ৪২ ভাগ। গণসাক্ষরতা অভিযান বলেছে, এই হার ৪১ দশমিক ৭ এবং ডেমোক্র্যাসি ওয়াচের পর্যবেক্ষণ ৪২ ভাগ এবং পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্ট বলেছে ৪৮ ভাগ। সাক্ষরতার হার নিয়ে বিভ্রান্তি এবং মতবিরোধ থাকলেও প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা শিক্ষিত, এটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মত। বিশ্বব্যাংক, নোরাডসহ দাতা সংস্থাও বলছে, এ দেশে শিক্ষার হার ৫০ ভাগের কাছাকাছি। সেই হিসাবে সাক্ষরতার হার বেড়েছে প্রায় ১০ থেকে ১২ ভাগ, আর ইতোমধ্যে খরচ হয়েছে ১২ হাজার ৮২৪ কোটি টাকা।

এক সময় বাংলাদেশ নিরক্ষরের দেশ হিসাবেই পরিচিত ছিল। এখন সে অবস্থার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। এর পাশাপাশি নিরক্ষরতা নিয়ে বাণিজ্য বেসাতি এখন 'ওপেন সিক্রেট'। সাক্ষরতার হার নিয়েও বিতর্ক বাগড়াক পর্যায়ে নেই। খোদ সরকারী হিসাবে এই হার নিয়ে রয়েছে ব্যাপক গোঁজামিল। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে সাক্ষরতার হার এখন ৬২ দশমিক ৪, পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রকাশিতব্য আদমশুমারির প্রতিবেদনে সাক্ষরতার হার উল্লেখ করা হয়েছে ৪৭ দশমিক ৫। অথচ গত জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষার হার ৬৫ ভাগ এবং জোট সরকার ক্ষমতায় এসে তা ৬৫ দশমিক ৫ ভাগ বলে দাবি করেছিল।

সাক্ষরতা সম্পর্কে পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক শিশির শীল বলেন, সাক্ষরতা নিয়ে কাজের কাজ যতটুকু হয়, তার চেয়ে বেশি হয় পলিটিক্যাল স্টান্টবাজি। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মুখ রক্ষার জন্য একেক সময় একেক সরকার প্রকৃত তথ্য গোপন করে অবাস্তব সব তথ্য তুলে ধরে, সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি।

আলোচিত ১৯ প্রকল্প '৯৩ সালের পর একে একে বাস্তবায়নের পর শিক্ষার্থী সংখ্যাও খুব একটা বাড়েনি। ১৯৯৬ সালে দেশে প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছিল ১ কোটি ৭৫ লাখ ৫৭ হাজার ৬৮৫। এই সংখ্যা ২০০৫ সালে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮০ লাখ। অর্থাৎ গত আট বছরে প্রাথমিক শিক্ষার্থী বেড়েছে প্রায় সাড়ে চার লাখ। বিশ্বব্যাংক এবং ইউনিসেফ বলছে, বাংলাদেশের ৩০ লাখ শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে। গত প্রায় এক দশক ধরেই দাতা সংস্থা একই পরিসংখ্যান দিয়ে আসছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে শিক্ষায় অগ্রগতি হয়েছে কতটা?

প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার বাড়ানো এবং ড্রপ আউট রোধে নব্বই পরবর্তী বিএনপি সরকারের প্রধান কর্মসূচী ছিল 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য'। শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীকে নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম চাল বা গম দিচ্ছেন, এমন স্পর্শকাতর সমালোচনার মুখে বিয়োগ দেয়া হয় ডিলার। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ডিলার নিয়োগে দলীয়করণ এবং মাথাপিছু বরাদ্দের তুলনায় কম খাদ্যশস্য প্রদানের অভিযোগ ওঠে জোরেশোরে। ২০০১ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে গত আমলে নিজেরই গ্রহণ করা এবং প্রশংসায় পঞ্চমুখ 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী বাতিল করে। এই কর্মসূচী সম্পর্কে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেছেন, সরকারী খাতে সবচেয়ে প্রশংসিত দরিদ্রমুখী কর্মসূচী 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' খাতে বরাদ্দের শতকরা ৭৫ ভাগই গরিবদের উপকারে আসেনি।

এদিকে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচী এখন বন্ধ। জেলা ও থানা পর্যায়ে সাত শ' কোটি টাকার এই প্রকল্পের ৪০০ কোটি টাকা ইতোমধ্যে ব্যয় হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে, এটি আর চলবে না। তাহলে প্রশ্ন, এই টাকা কি পানিতে গেল?

দুর্নীতির মহোৎসব ঠেকাতে খোদ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ত্যক্তবিরক্ত হয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিএনএফই) বিলুপ্ত করে দিলেন। সরকারী মূল্যায়নই হচ্ছে, ৬৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক সাফল্য প্রচার করা হলেও অবস্থাটা হচ্ছে 'কাজীর গরু কেতাবে আছে গোয়ালে নেই'। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। প্রধানমন্ত্রী এক বছর আগে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতর বিলুপ্তির পর পরই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা জাহানারা বেগমের নির্বাহী ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নেন।

দাতা সংস্থাসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার দশ প্রকল্পে প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা খরচের পর নতুন বিনিয়োগ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। একটি প্রকল্পেরও মেয়াদ বৃদ্ধি না করায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, দাতা সংস্থাগুলো মোটেও সন্তুষ্ট নয়। এদিকে এনজিও নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে ইউনিসেফ নাখোশ হয়ে অতি সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে আসা ৬০০ কোটি টাকা ফেরত নিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় এখন চলমান তিন প্রকল্পের একটি হচ্ছে ১১ দাতা সংস্থার অর্থায়নে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প। এ ছাড়া প্রায় ৩ হাজার ৩১২ কোটি টাকার প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তি প্রকল্প মাঝামাঝি পর্যায়ে। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য প্রায় চার শ' কোটি টাকার আরও একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলছে।

মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা চালু, দরিদ্র শিশুদের স্কুলে আনা এবং ঝরে পড়ার হার কমাতে সরকারসহ দশ দাতা সংস্থা প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন (পিইডিপি-২) নামে একটি বিশাল প্যাকেজ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে এটি এ যাবতকালের সবচেয়ে বড় কর্মসূচী। সরকার এবং ১১ দাতা সংস্থা প্রকল্পের ধারণা বর্জন করে একই ছাতার নিচে এই কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৮ প্রকল্প রয়েছে এই প্যাকেজের আওতায়। এতে নির্মাণ করা হবে ৩৫ হাজার বিদ্যালয়ে একটি করে কক্ষ। প্রায় ৩৫ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে পাঁচ হাজার কোটি টাকার চলমান প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে ভাল উদ্যোগ। কিন্তু এই প্রকল্পে যে ৩৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ পাবে, সেখানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অবধারিত। আর তা ঠেকাতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করা এই প্রকল্পে অযোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে যেনতেন শিক্ষাই পাবে শিক্ষার্থীরা।